IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

রবীন্দ্র ছোটগল্পে সমাজে পুরুষ

(Men in Society in Rabindranath Tagore's Short Stories)

ড. সুপ্রিয়া দাস*

এসোসিয়েট প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, রামঠাকুর কলেজ, আগরতলা, ত্রিপুরা

ড. অরূপা চক্রবর্তী

বাংলা বিষয় শিক্ষক, হেনরি ডিরোজিও একাডেমি, আগরতলা, ত্রিপুরা

Abstract

Rabindranath Tagore narrated inner conflicts, moral issues, family and societal relationship of men instead of portraying them as one dimensional figure. Short stories by Tagore display male character as social beings influenced by complex tradition, emotion and evolutionary processes. These characters narrate broader societal structures during colonial periods in Bengal predominated by issues like patriarchy, hierarchy, nationalism, movement for modernity among others. In present study, it is attempted to examine important male characters from short stories like Bhupati in *Nashtanirh*, Ramsundar in *Dena Paona*, Gaurishankar in *Haimanti* and few other characters. Each character in respective stories displayed unique psychological and societal dimensions. The helplessness of a father trapped in dowry system due to economic inequalities is highlighted male character Ramsundar. While character Bhupati reflects intellectual idealism leading to emotional issues and domestic breakdown. Influence of intellectual and philosophical ideals of fatherhood are reflected through the character Gaurishankar in *Haimanti*. Tagore critiques the then rigid social systems and customs as major catalysts for the tension between tradition and modernity. He highlights such rigid systems as major contributors for emotional degeneration among human bonding. Most of these characters exhibit moral confusion, social isolation including tragic self-realization highlighting limitations of societal expectations and ambition of men. Very often, Tagore emphasised, need for awareness on moral values, empathy and human interconnectedness for societal development. Thus, male characters in Tagore's stories are symbolic representations of contradictions and strength in the society instead of a mere individual. These characters also provide deep insights into psychological and societal scenarios of Bengal during early twentieth century.

Keywords: Male characters, colonial Bengal, emotional conflict, modernity, tradition, social critique.

এক শিল্পভুবন, এক অবিচ্ছিন্ন নন্দনতা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্প বাংলা কথাসাহিত্যের এমন এক অনন্য শিল্পপরিসর, যেখানে ব্যক্তি, সমাজ, ইতিহাস এবং মানবমনের এক গভীর মনস্তাত্ত্বিক ঐক্যে রূপলাভ করেছে। বাংলা ছোটগল্পকে আধুনিক শিল্পরূপে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান কেবল আঙ্গিকগত নয়, মানুষের অস্তিত্বকে বহুমাত্রিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করার যে নতুন সাহিত্যদৃষ্টি তিনি দিয়েছেন, তা বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। আসলে রবীন্দ্রনাথে সাহিত্যিক বহুমুখী প্রতিভার সবচেয়ে সুসমন্বিত প্রকাশ ছোটগল্পে। কারণ একই শিল্পপরিসরে কাহিনির সংহতি, চরিত্রসৃষ্টি, কাব্যিকতা, নাটকীয়তা,

সমাজচেতনা এবং মানব-মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এখানে এক অনন্য শিল্প ঐক্যে পরিণত হয়েছে। এই ছোটগল্প কেবল সাহিত্যিক নয়, এটি আধুনিক মানুষের আত্মপরিচয় নির্মাণের এক গভীর সাংস্কৃতিক দলিল।

রবীন্দ্র-সমালোচনার দীর্ঘ ইতিহাসে নারীচরিত্র, পল্লিজীবন কিংবা জাতীয়তাবোধ, মানবতাবাদ, সমাজভাবনা নিয়ে বিপুল আলোচনা সঞ্চিত হলেও তাঁর সৃষ্ট গল্পের পুরুষচরিত্রকে নিয়ে বিচার করার ক্ষেত্রটি তুলনামূলকভাবে সীমিত। এই অনালোচিত ক্ষেত্রই বর্তমান সূত্রটির মধ্যে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। রবীন্দ্রগল্পের পুরুষ কখনও কেবল পিতৃতান্ত্রিক ক্ষমতার প্রতিমূর্তি নন, আবার প্রচলিত অর্থে নায়কত্বও নন। তিনি একই সঙ্গে আত্মদ্বন্দ্বে বিদীর্ণ, জাগতিক সংকটে আক্রান্ত, সম্পর্কের জালে আবদ্ধ। প্রেম ও বিচ্ছেদের অভিজ্ঞতায় রূপান্তরিত এবং আত্ম-সমালোচনায় ক্রমাগত পুনর্নির্মিত এক মানবিক সত্তা তাঁর পুরুষচরিত্রের প্রকৃত শক্তি। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে পুরুষত্ব কোনো স্থির সামাজিক আধিপত্যে নয়, বরং আত্মজিজ্ঞাসা, সহমর্মিতা এবং নৈতিক দায়বোধে বিহিত।

রবীন্দ্রনাথের পূর্ববঙ্গ-অভিজ্ঞতা তাঁর চরিত্রসৃষ্টিকে এক বিশেষ বাস্তব ভিত্তি প্রদান করেছে। জমিদারি জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁকে গ্রামীণ সমাজের অন্তস্তলে যুক্ত করেছিল। সেই কারণেই তাঁর গল্পে কৃষক, ভৃত্য, জমিদার, কেরানি, শিক্ষক, পিতা কিংবা নিঃসঙ্গ পথিক—প্রত্যেক পুরুষ নিজস্ব সামাজিক অবস্থান অতিক্রম করে বৃহত্তর মানবিক সত্যের প্রতিনিধি হয়ে ওঠে। এই চরিত্রগুলি কোনো একরৈখিক নৈতিকতার বাহক নয়, বরং ব্যক্তি স্বাধীনতা ও সামাজিক নিয়ম, ক্ষমতা ও মমতা, আকাঙ্ক্ষা ও ত্যাগ, আত্মসংযম ও কর্তব্যবোধের জটিল টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে তাদের অস্তিত্ব গঠিত হয়। এখানেই রবীন্দ্রনাথের চরিত্রনির্মাণ আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক সাহিত্যের সঙ্গে সংলাপে প্রকাশ করে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্পে পুরুষ চরিত্রগুলি বিভিন্ন রূপে সমাজের চিত্র ফুটিয়ে তোলে। তিনি পুরুষ চরিত্রগুলোকে শুধু সমাজের অংশ হিসেবে না দেখিয়ে, তাদের ব্যক্তিগত আবেগ, অনুভূতি, এবং সামাজিক অবস্থানও তুলে ধরেছেন। তাঁর গল্পে পুরুষ চরিত্রগুলি প্রায়শই সমাজের প্রচলিত নিয়ম-কানুন, সংস্কার, এবং প্রথাগত ধারণার সাথে সম্পর্কিত। পুরুষ চরিত্রগুলো সমাজের বিভিন্ন রূপে নিজেদের প্রকাশ করে, যেমন – পিতা, স্বামী, প্রেমিক, এবং বন্ধু।

রবীন্দ্র ছোটগল্পে পুরুষ চরিত্রগুলির বিভিন্ন দিক রয়েছে – রবীন্দ্রনাথের গল্পে দেখা যায়, কিছু পুরুষ চরিত্র প্রথাগত সামাজিক নিয়ম-কানুন মেনে চলে, যেমন – "কঙ্কাল" গল্পে রাজীব চরিত্র। অন্যদিকে, কিছু পুরুষ চরিত্র সমাজের পুরনো ধারণা ও প্রথা ভেঙে নতুন পথে চলতে চেষ্টা করে। আবার কিছু গল্পে পুরুষ চরিত্রগুলির অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থানও প্রতিফলিত হয়। যেমন – "দেনাপাওনা" গল্পে ধনী ও গরিব মানুষের মধ্যে সম্পর্ক এবং "মণিহারা" গল্পে বিভিন্ন অর্থনৈতিক স্তরের মানুষের জীবনযাত্রা। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে পুরুষ চরিত্রগুলি আবেগ ও অনুভূতির দিক থেকেও ভিন্ন। কেউ ভালোবাসে, কেউ ঘৃণা করে, কেউ হতাশ হয়, কেউ আবার প্রতিশোধ নিতে চায়।

নিম্নে রবীন্দ্র ছোটগল্পে সমাজের পুরুষ চরিত্রগুলি নিয়ে আলোচনা করা হলো –

'দেনাপাওনা' গল্পে রামসুন্দর মিত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্প 'দেনাপাওনা' গল্পে লেখক যে কন্যা দায়গ্রস্ত পিতা এবং ধনী ও গরিবের যে সমাবেশ ঘটিয়েছেন তা 'দেনাপাওনা' গল্পের রামসুন্দর মিত্রের চরিত্রে ফুটে উঠেছে।

নিরুপমার বাবা রামসুন্দর একটি বড়ো ভুল করে যে মাশুল দিলেন তা দুটি জীবনে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। দশ হাজার টাকার বিনিময়ে 'উপযুক্ত' পাত্রকে হাতছাড়া করতে চাননি, রামসুন্দর মিত্র অসম্ভব জেনেও দশ হাজারের ব্যবস্থা হবে বলে বিবাহের আয়োজন করেন। ভেবেছিলেন বিবাহের পর হয়ত কিছু কমে পার পেয়ে যাবেন। কিন্তু মনুষ্যচরিত্র তাঁর অজ্ঞাত, বিশেষত রায়বাহাদুরের চরিত্র নিরুপমার অবস্থার কথা ভেবে তিন হাজার টাকা অনেক অপমান ও লাঞ্ছনায় জোগাড় করে রায়বাহাদুরের কাছে যান, কথাটি জানতে যে

নিরুপমাকে যেন তার সঙ্গে কয়েকদিনের জন্য তার বাড়িতে থাকার অনুমতি দেন, কিন্তু পরিণাম আন্দাজ করে তাঁর প্রতি অবজ্ঞার ফলে, রামসুন্দর মিত্র হাসি মুখে বেহাইয়ের কাছে পাড়ার খবর বললেন, "হরেকৃষ্ণ বাড়িতে একটা মস্ত চুরি হইয়া গিয়াছে, তাহার আদ্যোপান্ত বিবরণ বলিলেন; নবীনমাধব ও রাধামাধব দুই ভাইয়ের তুলনা করিয়া বিদ্যাবুদ্ধি ও স্বভাব সম্বন্ধে রাধামাধবের সুখ্যাতি এবং নবীনমাধবের নিন্দা করিলেন।" (১)

তিন হাজার টাকা পুনরায় রামসুন্দর উত্থাপন করলে অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন, "থাক্, বেহাই, ওতে আমার কাজ নেই।" (২) এমনকি একটি বাংলা প্রবাদ ব্যবহার করে বলেন, "সামান্য কারণে হাতে দুর্গন্ধ করিতে তিনি চান না।" (৩)

অতএব গৃহে প্রত্যাবর্তন ব্যতীত অন্য কোনো গতি তার রইল না এইবার তাঁর শেষ অবলম্বন বসতবাড়িটি বিক্রির জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। কন্যার গৃহে গেলেন বটে এবং মেয়েকে আশ্বস্তও করলেন, কিন্তু বড়ো ছেলে হরমোহন আর দুটি ছোটো ছেলে সঙ্গে নিয়ে তাড়াতাড়ি ঘরে প্রবেশ করল। এবং পিতাকে বলেন, বাবা আমাদের তবে পথে বসালে। সমস্ত কথা জেনে নিরুপমা বাবাকে বাধ্য করল ভাইরা যাতে গৃহ ছাড়া না হয়।

ঋণের কলঙ্ক মোচনের হাত থেকে এবারও রামসুন্দর রক্ষা পেল না। তিনি বুঝলেন কী নিদারুণ লাঞ্ছনার মধ্যে মেয়েকে রেখে এলেন, কিন্তু রামসুন্দরের কিছু করার ছিল না। মানুষ তো আশাতেই বেঁচে থাকে এবং অসম্ভব আশার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, এক্ষেত্রেও এমনটাই ঘটল। কিন্তু তিনি তখন বোঝেন নি এর ফলে নিরুপমার মৃত্যু ত্বরান্বিত হয়ে যাবে।

রায়বাহাদুর অর্থলোভী তা বুঝতে তিনি পেরেছিলেন, কিন্তু তিনি এমন নিষ্ঠুর এবং নিরুপমার শাশুড়ি নিষ্ঠুরতমা-এ আশা তিনি মনেও জায়গা দেননি। অমাহারে বিনা ওষুধে, পথ্যে, চিকিৎসায় নিরুপমার মৃত্যু হলো। রায়বাহাদুর এমনি ধাঁচের মানুষ কী ঘটা করে নিরুপমার অন্ত্যেষ্টি করেছিলেন তার বিবরণ দিলেন নিরুপমার বাবাকে। বিড়ম্বিত পিতা এ সমাজে বলীপ্রদত্ত, এই তাঁর প্রাপ্য। আর এখানেই লেখকের লেখনীতে রামসুন্দর চরিত্রে সমাজের ধনী ও গরিবের সম্পর্ক এবং দায়গ্রস্ত কন্যার পিতার ভূমিকায় স্পর্শভাবে ফুটে উঠেছে।

'নষ্টনীড়' গল্পে ভূপতি

'নষ্টনীড়' 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত গল্পগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ গল্প। এই গল্পটির প্রথম লক্ষণীয় দিক সামাজিক ও পারিবারিক বিন্যাসের চিরন্তন রূপটিকে তুলে ধরা। 'নষ্টনীড়' গল্পের ভূপতি হল গল্পের প্রধান চরিত্রগুলোর মধ্যে একজন। সে একজন অর্থবান, কিন্তু মন দিয়ে সুখী নয়। সে তার কাজের জন্য বাইরে বেশি সময় কাটায় এবং স্ত্রীর সাথে তার সম্পর্ক তেমন গভীর নয়।

একসময়ে ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষে পিতৃপুরুষ উপার্জিত বহুতর অর্থের অধিকারীদের নানান বিলাস-বাসনের পরিচয় আমাদের অজ্ঞাত নয়। জীবন উপভোগের নানাবিধ রসদ হাতের কাছে মজুত রাখার অভ্যাস ও আয়োজনে তারা দক্ষ ছিলেন। স্ত্রী যতই রূপবতী-গুণবতী হোক না কেন, অন্য নারীর প্রতি আসক্তির প্রমান বহু পাওয়া যায়। নেশার অভাব তাদের কখনো কম হয়নি। কিন্তু ভূপতি চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিধাতার হৃদয় অন্যরূপ ছিল। তার কাজের দরকার ছিল না। কিন্তু গ্রহবশত কাজের লোক হয়ে উঠেছিলেন। ছেলেবেলা থেকেই ইংরেজি লেখার ও বক্তৃতা দেওয়ার শখ ছিল। তাই সভাস্থলে দু-চারটি কথা বলার সুযোগকে তিনি হাতছাড়া করতেন না। অন্যের কাগজে লেখা এক আর নিজের পত্রিকায় স্বাধীন মতামতে দেওয়া, মন খুলে লেখা আর এক সুযোগ। রাজনৈতিক মতামতে সম্পাদকেরা হাত দেবেনই, যেহেতু ইংরেজ রাজত্বে নির্বিঘ্নে তাদের পত্রিকা চালিয়ে যেতে হবে। তাই চিঠিই হোক, আর প্রবন্ধই হোক, সম্পাদকের কলম তাতে পড়তেই পারে। অতএব শখ ও নেশা চরিতার্থতার প্রধান হাতিয়ার নিজস্ব পত্রিকা।

নেশা যখন উগ্র হয়, তখন অনেক কাছের বস্তু দৃষ্টির বাইরে চলে যায়। তাই বালিকাবধূ কখন যৌবনে পরিণতি হয়েছে, গুরুতর সংবাদের মধ্যে এই তুচ্ছ সংবাদটি সম্পাদকের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। রাজনৈতিক উত্তেজনায় ভরপুর ভূপতি বোঝেননি শত ঐশ্বর্য পদমূলে ঢেলেও নারীর হৃদয় লাভ করা যায় না। আবার কোনো আয়াস ছাড়া একটি নারীর হৃদয় উদ্বেল হয়ে উঠতে পারে।

একসময় চারুকে তিনি বলেছিলেন, তিনি কবিতা বোঝেন না, বোঝেন মানুষকে। অথচ এত কাছে থেকেও উমাপদর মতো কৃতঘ্ন মানুষের চারিত্রিক পরিচয়ের বিন্দুমাত্র বোঝেননি। যে অকৃত্রিমতা, সারল্য ও বিশ্বাস দিয়ে গঠিত ছিল ভূপতির মনোলোক তাতে এই রূপ-কুশিল-কঠোর হৃদয়হীন জগৎকে তার পক্ষে বুঝে ওঠা স্বাভাবিক নয়। সর্বস্বান্ত হয়ে মানুষের বিশ্বাস হারিয়ে যখন চারুর কাছে যখন এসেছেন, তখন মনে হয়েছে একাকিনীকে সঙ্গ দিতে হবে, তখন কবিত্বকে আশ্রয় করেছেন। অথচ কবিত্ব না জানা তার গর্বের বিষয় ছিল। একথা ভুলে চারুর পরিশীলিত মনের অংশভাগী হতে চেয়ে দেখেছেন, তার অন্তর জুড়ে অমল নামক একটি যুবক, সেই অন্তরে তার জন্যে বিন্দুমাত্র জায়গা খালি পড়ে নেই। এখন তার মনে হতে বাধ্য সব সিদ্ধান্তই আগাগোড়া ভুলে-ভরা, রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে মেতে ওঠা, পত্রিকা বের করে, পত্রিকার জন্যে প্রথম উমাপদ, তারপর মন্দাকিনীকে আনয়ন, অমলকে আশ্রয় দেওয়া ঠিক ঠিক মুহূর্তে যা যা করণীয় ছিল, তার কোনটিই করা হয়নি।

ফলে অপরিসীম ব্যর্থতা পরিনতিব্যাপী বিস্তীর্ণ হয়েছে। অথচ এমনটি হওয়ার কথা নয়, সততা, নিষ্ঠা, বিশ্বাস, হৃদয় কোনোটির উদারতায় ঘাটতি ছিল না। তারপর বাইয়ের জগতে বিফল-মনোরথ হয়ে ঘরে এসে সীমাহীন শূন্যতা দেখতে হয়েছে তাকে। তার জীবচ চরম ট্র্যাজেডিতে পূর্ণ হয়েছে। যেখানে স্বজনহীন, বন্ধুহীন, বিশ্বাসহীন, এক নির্বাসিত পৃথিবী পর্যন্ত তার জন্য বরাদ্দ হয়েছে। এখানেই ভূপতির চরিত্রটি সমাজের সমগ্র মনুষ্যজাতির ট্র্যাজেডি-এর মর্মমূলে নিহিত।

’পোস্টমাস্টার’ গল্পের পোস্টমাস্টার

পোস্টমাস্টার গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ‘হিতবাদী’তে ১২৯৮ বঙ্গাব্দে। ‘পোস্টমাস্টার’ গল্পের পোস্টমাস্টার চরিত্রটি এক ধরনের হতাশ ও আত্মকেন্দ্রিক যুবক, যিনি শহরের জীবন ও সংস্কৃতির সাথে মানিয়ে নিতে পারেন না। গ্রামের পরিবেশের তিনি একাকিত্ব অনুভব করেন এবং রতনের সাথে তার সম্পর্ক তৈরি হয়, যা তাকে কিছুটা আনন্দ দেয়। তবে, তিনি তার দায়িত্ব পালনে উদাসীন এবং রতনের প্রতি তার আবেগও দ্রুত ফুরিয়ে যায়।

কবি পোস্টমাস্টারের মানসিক অবস্থার বর্ণনার প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, ‘আমাদের পোস্টমাস্টার কলিকাতার ছেলে। জলের মাছকে ডাঙায় তুলিলে যেরকম হয়, এই গন্ডগ্রামের মধ্যে আসিয়া পোস্টমাস্টারেরও সেই দশা উপস্থিত হইয়াছে। একখানি অন্ধকার আইচালার মধ্যে তাঁহার আপিস; অদূরে একটি পানাপুকুর এবং তাহার চারিপাড়ে জঙ্গল। কুঠির গোমস্তা প্রভৃতি যে-সকল কর্মচারী আছে তাহাদের ফুরসত প্রায় নাই এবং তাহার ভদ্রলোকের সহিত মিশিবার উপযুক্ত নহে।‘ (৪) এই অবস্থায় একাকিত্বের ঘোর আরো বেড়ে যায় এবং শহরের জীবন ও বন্ধুদের কথা স্মরণ করেন।

অসম বয়সী, শিক্ষার সঙ্গে আজন্ম সম্পর্কবিযুক্ত রতনের সান্নিধ্যেই তাকে সময় কাটাতে হয়। গন্ডগ্রামের পোস্ট-আপিস, সেখানে কাজও কম তুলনামূলক ভাবে, তাই অঢেল সময়, এই সময় দুর্ভার হয়ে দাঁড়ায়। সে কথা বলতে ভালোবাসে উপযুক্ত ব্যক্তি পেলে, কিন্তু শহুরে মানুষ, প্রকৃতিপ্রেম তার থাকবার কথা নয়, তাছাড়াও গন্ডগ্রামের প্রকৃতি মোটেই আকর্ষণ নয়। কিন্তু এখন থেকে উদ্ধার পাবার উপায় নেই।

কিন্তু গল্পের সময়সীমায় ম্যালেরিয়ার উৎপাত ছিল বেশি। এবং সেই জ্বরেই পড়ে গেল পোস্টমাস্টার। এবার বহু চেষ্টার পর তার বদলির নির্দেশ এল। গন্ডগ্রাম থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগ ঘটল।

অসুখের সময় বালিকা রতন তার সেবা করেছে, নইলে তার রক্ষা ছিল না, সেই সেবাযত্নের জন্য সে রতনের কাছে কৃতজ্ঞ, বদলির পর যে পোস্টমাস্টার আসবে সে যেন রতনকে কাজে রাখে তার ব্যবস্থায় উদ্যোগ নেয় পোস্টমাস্টার শুধু রোগীর রোগ উপশমের জন্য রতনের কাছে সে কৃতজ্ঞ নয়, এই বালিকা সবসময় তার সুখ-সুবিধার দিকে সবসময় নজর দিয়েছে, একাকিত্ব কাটিয়ে দিয়েছে। তার জন্য মন খারাপ হওয়া স্বাভাবিক, না হলে তাকে পাষণ্ড বলতে হয়।

তার চলে যাবার সময় অভিমানী বালিকাকে সে প্রত্যক্ষ করে, বিদায় মুহূর্তে কাছে আসে না, সেও অভিমান প্রসূত, বুঝতে পোস্টমাস্টারের অসুবিধা হয় না। এতদিন কাছাকাছি বাস করে যে সৌহার্দ্য তৈরি হয়েছে তা তো অস্বীকার করার নয়।

একা নৌকায় উঠে বর্ষা বিস্ফারিত নদীস্রোতে এক বালিকার মুখচ্ছবি "এক বিশ্বব্যাপী বৃহৎ অব্যক্ত মর্মব্যথা প্রকাশ করিতে লাগিল। একবার নিতান্ত ইচ্ছা হইল, 'ফিরিয়া যাই, জগতের ক্রোড়বিচ্যুত সেই অনাথিনীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসি' – কিন্তু তখন পালে বাতাস পাইয়াছে, বর্ষার স্রোত খরতর বেগে বহিতেছে।" (৫) এখানেই পোস্টমাস্টারের মানসিকতা পরিবর্তনশীলতার প্রমাণ পাইয়া যায়। রতনের প্রতি তার আবেগ প্রথমে খুব বেশি ছিল, কিন্তু সময়ের সাথে সাথে তা কমে যায়। গ্রাম ত্যাগ করার সময় তিনি রতনকে ভুলে যান।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পোস্টমাস্টার' ছোটগল্পে পোস্টমাস্টার চরিত্রটি গল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই চরিত্রটি মানুষের আবেগ, দায়িত্ব, এবং সমাজের প্রতি উদাসীনতার মতো বিভিন্ন দিক তুলে ধরে। গল্পের শেষে রতনের প্রতি পোস্টমাস্টারের উদাসীনতা এবং গ্রাম ত্যাগের সিদ্ধান্ত পাঠকদের এক ধরনের বেদনার সৃষ্টি করে।

'মণিহারা' গল্পের ফণীভূষণ

'ভারতী' পত্রিকার ১৩০৫ বঙ্গাব্দে অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে 'মণিহারা' গল্পটি। 'মণিহারা' গল্পে ফণীভূষণ চরিত্রটি একটি জটিল ও আকর্ষণীয়। তিনি একজন শিক্ষিত ধনী এবং আধুনিক বাঙালি, যিনি স্ত্রীকে ভালোবাসার ধরনটা বেশ অদ্ভুত। ফণীভূষণ স্ত্রীকে আবদার মেটাতে রাজি হন, কিন্তু নিজের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে চান না।

ফণীভূষণ ইংরেজি শিক্ষিত এবং আধুনিক বাঙালি সমাজে বসবাস করেন। তিনি পৈতৃক সূত্রে ধনী ছিলেন, কিন্তু তার মধ্যে আধুনিক মানসিকতার ছাপ স্পষ্ট। ফণীভূষণ তার স্ত্রী মণিমালাকে এতটা ভালোবাসতেন যে সে ঘরেও মাসি-পিসি ও অন্যান্য পরিজনদের উপকারার্থে সুন্দরী স্ত্রী ঘরে আনেনি, বরং স্ত্রীকে আর পাঁচজনের কাছ ছাড়া করে এই কুঠিতে একলা নিজের কাছে রেখেছে, হয়ত তার মূঢ় ধারণা এই যে অন্যের কাছ থেকে স্ত্রীকে নিজের কাছে রাখলে তাকে বেশি করে পাওয়া যায়। এই যে স্ত্রীকে অন্যদের কাছ থেকে নিজের কাছে রেখে দিলেন ফণীভূষণ শুধু স্ত্রীর ভালোবাসার জন্য তাতে কোনোভাবেই প্রমাণ হয় না যে, নিজের কাছে রাখলেই বেশি ভালোবাসা পাওয়া যায়, তা নাও হতে পারে। এমনকি স্ত্রীর আবদার মেটাতে তিনি সবকিছু করতে রাজি হন, নিজের ইচ্ছাকেও জলাঞ্জলি দিতেও ভাবেন না কখনো।

মোট কথা এই যে, যদিচ রন্ধনে নুন কম হইত না এবং পানে চুন বেশি হইত না, তথাপি ফণীভূষণের হৃদয় কী যেন-কী নামক একটা দুঃসাধ্য উৎপাত অনুভব করিত। স্ত্রীর কোনো দোষ ছিল না, কোনো ভ্রম ছিল না, তবু স্বামীর কোনো সুখ ছিল না।

হঠাৎ ব্যবসায় ভাঁটার টান পড়ল, স্থানীয় মহাজনদের কাছ থেকে ঋণের ব্যবস্থা হলো না। আর অপরিচিত স্থানে ঋণের চেষ্টা করে দেখা যায়, যে সেখানে উপযুক্ত বন্ধক না রাখলে চলে না, গহনা বন্ধক রাখলে লেখাপড়া এবং বিলম্বের কারণ থাকে, তাড়াতাড়ি এবং সহজেই কাজ হয়ে যায়। ফণীভূষণ একবার স্ত্রীর কাছে

গিয়েছে। কিন্তু স্ত্রীর কাছে যাবার ক্ষমতা ফণীভূষণের ছিল না। সে তার স্ত্রীকে অনেক ভালোবাসত। যার কারণে দেখা যায় ফণীভূষণ স্পষ্টভাবে তাঁর স্ত্রীকে বলতে পারল না, "ওগো, আমার দরকার হইয়াছে, তোমার গহনাগুলো দাও।"(৬)

ফণীভূষণ একজন নব্য বাঙালি, কিন্তু তার মধ্যে পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার তেমন কোনো প্রকাশ নেই। তিনি স্ত্রীকে সমান অধিকার দেন এবং তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। যেখানে মণিমালা কঠিন মুখ করে হাঁ-না কিছুই উত্তর দিল না, তখন সে অনেক আঘাত পেয়েছিল মনে তবুও আঘাত করল না।

দিন দশেক পরে কোনো মতে যতোপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ করে বিপদ থেকে মুক্তি পেয়ে ফণীভূষণ বাড়ি ফিরে এলো, ভাবল বাপের বাড়িতে গহনাগুলো রেখে মণিমালা নিজবাড়িতে ফিরে এসেছে। কিন্তু শয়নকক্ষের দিকে চেয়ে দেখল দরজা বন্ধ, তালা ভেঙে ঘরে ঢুকে দেখে ঘর শূন্য, কোণে খোলা সিন্দুক পড়ে আছে, তাতে গহনার চিহ্নমাত্র নেই। বুকের মধ্যে নিদারুণ আঘাত অনুভব করল, সংসার হলো উদ্দেশ্যহীন এবং ভালোবাসা ও ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যর্থ হলে বলে প্রতীতি জন্মাল। কেবল প্রতীক্ষা, অনন্ত প্রতীক্ষা, সেকারণে মণি অলংকারের আওয়াজ শুনতে পান। উৎকণ্ঠা- উদ্বেগে জীবনমৃত হয়ে বাঁচতে হলো, শরীর আছে, মন নেই, মন হয়ত আছে তা কেবলি মণিময়- কিন্তু মণি জীবিত এ মনে করা যথার্থ নয়।

ফণীভূষণের চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তিনি একজন আধুনিক, শিক্ষিত এবং ভালোবাসার মানুষ, কিন্তু তার মধ্যে নিজের ইচ্ছাশক্তি ও কর্তৃত্বের অভাব রয়েছে। তিনি স্ত্রীর প্রতি এতটাই দুর্বল যে, স্ত্রীর ইচ্ছের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করে দেন। এই দুর্বলতা তার চরিত্রকে একটি জটিল রূপ দিয়েছে।

'হৈমন্তী' গল্পে গৌরী শংকর

'হৈমন্তী'র প্রথম প্রকাশ 'সবুজপত্রে', ১৩২১ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায়। 'হৈমন্তী' গল্পে গৌরী শংকর চরিত্রটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তিনি একজন কর্মব্যস্ত, আদর্শবাদী এবং কিছুটা উদাসীন পিতা। তিনি নিজের কর্মের প্রতি বেশি মনোযোগ দেন, যা মেয়ের বিয়ে বা পারিবারিক জীবনের প্রতি মনোযোগ দিতে বাধা সৃষ্টি করে।

'হৈমন্তী' গল্পে হৈমন্তীর বাবা গৌরীশংকর একটি অনন্য চরিত্র। রবীন্দ্রনাথের মনোজগতের মহর্ষির যে অপরিচিত প্রভাব, সেই আদলে তাঁর সাহিত্যে বেশ কিছু চরিত্রের উপস্থাপনা দেখা যায়। তবে অন্যান্য চরিত্রের সঙ্গে গৌরীশংকরের পার্থক্য তাঁর ধর্মমতে কিংবা বলা ভালো ধর্ম বিষয়ক মতামতে। তবে রবীন্দ্রনাথ যে সবার অর্থে একটি ধর্মকেই বড়ো করে দেখেছেন সেই মানবধর্ম যা প্রচলিত ধর্মের মধ্যে আবদ্ধ নয়। গৌরীশংকর সংসারে থেকেও সন্ন্যাসী তাঁর স্নেহের 'বুড়ি'র প্রতি প্রবল স্নেহ ও আসক্তি তাঁকে লৌকিক জীবনের বন্ধনে আবদ্ধ রেখেছে, আবার এক প্রবল ঔদাসীন্যে নিজের ধ্যান-ধারণা ও জীবনের প্রচলিত পথ থেকে মনুষ্যত্বের গভীর অনুধ্যানে তুচ্ছ সংসারিক জীবনের ধারা থেকে ভিন্নতর খাতে প্রবাহিত করেছে।

"বস্তুত, আমার শ্বশুর ব্রহ্মাও নন, খৃস্টানও নন, হয়তো বা নাস্তিকও না হইবেন। দেবার্চনার কথা কোনো- দিন তিনি চিন্তাও করেন নাই।"(৭) ধর্মকে রবীন্দ্রনাথ কী চক্ষে দেখিয়েছেন, তাহারই চিত্র রেখাঙ্কনে ফুটিয়াছে হৈমন্তীর পিতার চরিত্রে। আর শিক্ষিত বাঙালির ধর্মবোধ কিরূপ, তার প্রকাশ পেয়েছে নায়কের আত্মকথাতে। "শিশির আমার চেয়ে কেবল দুই বছরের ছোট। অথচ, আমার পিতা যে গৌরীদানের পক্ষপাতী ছিলেন না তাহা নহে ...", (৮) গল্পকথকের বয়ানের সূত্রে গৌরীশংকর সম্পর্কে আরও নানা বিষয় জানা যায়, যে গৌরীশাংকর পশ্চিমের এক পাহাড়ের কোনো রাজার অধীনে বড়ো কাজ করতেন। আর এ থেকে হৈমন্তীর শ্বশুরের ধারণা হয়েছিল যে হৈমন্তীর পিতা উজির-নাজির গোছের কিছু ছিলেন। তিনি বরপণও ভালোই দিয়ে ছিলেন, কিন্তু পরে যখন খোঁজ নিয়ে জানা যায়, যে তিনি সেখান-কার শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ। "বাবা বলিলেন,

অর্থাৎ ইস্কুলের হেডমাস্টার সংসারে ভদ্রপদ যতগুলো আছে তাহার মধ্যে সব চেয়ে ওচা। বাবার বড়ো আশা ছিল, শ্বশুর আজ বাদে, কাল যখন অবসর লাইবেন তখন আমিই রাজমন্ত্রী হইব।"(৯)

গৌরীশংকর একজন সৎ এবং আদর্শবাদী মানুষ। তিনি সমাজে প্রচলিত কিছু নিয়ম-কানুন মানতে চান না। তিনি মনে করেন, মেয়ের বিয়ে তার ইচ্ছের ওপর নির্ভর করে। আবার দেখা যায়, তিনি হৈমন্তীর বিয়ে নিয়ে তেমন কোনো চিন্তা করেন না। তিনি কর্মব্যস্ততার কারণে মেয়ের ভবিষ্যতের কথা তেমন ভাবে না। মোট কথা হৈমন্ত্রীর প্রতি কিছুটা উদাসীন। গৌরীশংকর-এর মেয়ের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি কিছুটা আধুনিক। তিনি মেয়েদের শিক্ষা ও স্বাধীনতা দিতে চান। এমনকি গৌরীশংকর এবং হেমন্তীর মধ্যে একটি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। গৌরীশংকর হৈমন্তীকে তার বন্ধু হিসেবে দেখেন এবং তার মতামতকে সম্মান করেন। গল্পের শেষে দেখা যায় পিতা ও কন্যার খুনসুটি। যেখানে কন্যা হাসতে হাসতে ভর্ৎসনা করে বলে, "বাবা, আর যদি কখনো তুমি আমাকে দেখিবার জন্য এমন ছুটাছুটি করিয়া এ বাড়িতে আস তবে ঘরে কপাট দেব।" (১০) প্রতি উত্তরে বাবা হাসতে হাসতে বলেন, "ফের যদি আসি তবে সিঁধকাটি সঙ্গে করিয়াই আসিব।"(১১)

গৌরীশংকরের এই চরিত্রটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সামাজিক সমালোচনা এবং নারী-পুরুষের সম্পর্কের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির একটি উদাহরণ। তিনি দেখিয়েছেন, কীভাবে কর্মব্যস্ততা এবং উদাসীনতা পারিবারিক সম্পর্কের উপর প্রভাব ফেলতে পারে।

"মেঘ ও রৌদ্র" গল্পের শশিভূষণ

"মেঘ ও রৌদ্র" গল্পে শশীভূষণ চরিত্রটি একজন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যুবক, যিনি গিরিবালার প্রতি দুর্বল। শশীভূষণ একজন প্রতিবাদী এবং সামাজিক সচেতন ব্যক্তি, যিনি গিরিবালা ও অন্য গ্রাম মেয়েদের অবস্থার প্রতি সহানুভূতিশীল। গল্পে শশীভূষণ গিরিবালার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেন এবং তাকে সাহায্য করার চেষ্টা করেন।

শুধু 'গল্পগুচ্ছে'র নয়, সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্যে শশিভূষণ এক ব্যতিক্রমী চরিত্র। প্রথম দর্শন থেকে গল্পের অন্তিমলগ্ন পর্যন্ত তার চারিত্রিক পালাবদল, ব্যক্তিত্বের অভিনব দিক-পরিবর্তন খুবই আকর্ষণীয়। নির্বিরোধ, আত্মমগ্ন, গ্রন্থকীট, উত্তাল জীবনপ্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন-ব্যক্তিত্ব সময় ও ঘটনার পারম্পর্যে মেরুবদল করেছে। সম্মুখের অখণ্ড রেষারেষি, সংঘর্ষময় জগতের দিকে দৃকপাত মাত্র না করে একটি অসমবয়সী বালিকার সঙ্গে বালসুলভ সম্পর্ক বজায় রাখা এবং পড়ার জগতে নিবিষ্ট হওয়া ছাড়া তার আর অন্য কর্ম ছিল না। এভাবেই একজন আইন- ডিগ্রিধারীর জীবন অতিবাহিত হয়ে যেত, আইনের প্যাঁচ-পয়জারে, কতো চক্রান্ত, কতো হানাহানির রক্তাক্ত ঘটনা সৃষ্টি করা সম্ভব-সবই দৃষ্টির বাইরে চলে যেত। এই ছিল তার মতো অনাবিল সারল্যে ভরা মানুষের ভবিতব্য, গিরিবালাকে প্রাথমিক শিক্ষাদান, তার সঙ্গে জাম খাওয়া নিয়ে অতিসাধারণ কথোপকথন-এতেই তার জীবনচক্র আবর্তিত হয়ে যেত। কিন্তু বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো অতিসাধারণ মাঝিদের জাল বিস্তার এবং ইংরেজ প্রভুর অবরুদ্ধ পথের কারণে তা ছিন্ন করে ফেলার মতো ঘটনার মধ্য থেকে একটি প্রতিবাদী মানুষ বেরিয়ে পড়ে। একবার খোলস থেকে বেরিয়ে পড়লে আর বিবরে ফিরে যাওয়া অসম্ভব এই প্রেক্ষিতে নিজেকে আমূল বদলিয়ে ফেলে শশিভূষণ। কিন্তু এ সংসার ভরে আছে অসংখ্য কৃতঘ্ন ও কাপুরুষ মানুষের উপস্থিতিতে, এসংবাদ স্বচ্ছতোয়া-সাদৃশ অন্তরবিশিষ্ট শশিভূষণের অজ্ঞাত ছিল। যাদের জন্যে তার এই লড়াই, কার্যকালে তারা অদৃশ্য, ডাকে সাড়া না পেলে সংগ্রামীকে একাই পথ চলতে হয়, শশিভূষণ সেভাবেই এগিয়ে চলে জীবন-সংগ্রামে। একবার যখন চিত্ত জেগেছে তখন তো নোতুন প্রভাত সম্মুখে উদ্ভাসিত। সেই আলোকে শশিভূষণ আলোকিত। নিজে আলোকিত হলেও সেই আলোয় অপরের চিত্ত কিন্তু তিমিরদুয়ার ভেদ করে আসতে সক্ষম হয়নি।

শশিভূষণের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ ছিল। সেই ক্ষীণতার মধ্যে দলাদলি, চক্রান্ত, ইক্ষুর চাষ, মিথ্যে মকদ্দমা এবং পাটের কারবার চোখে পড়ত না। তাছাড়া নিজের বৃত্তে নিমগ্নচিত্ত বলে আইনপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও কোনো কর্মে ভিড়তে পারেনি, বাবার আগ্রহে বিষয়কর্মে নিয়োজিত হলেও তাতে মন বসাতে পারেনি বলে পল্লীবাসীদের বিস্তর উৎপীড়ন, উপহাস ও লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছিল। তদুপরি পাত্র হিসেবে উপযুক্ত হয়েই বিবাহ বিরাগহেতু কন্যাদায়গ্রস্ত পিতামাতারা তাকে দুঃসহ অহঙ্কার জ্ঞান করে ক্ষমার অযোগ্য বিবেচনা করেছিলেন। এক গিরিবালা ছাড়া গ্রামের অন্য কাউকে প্রসন্ন করে এমন ক্ষমতা তার ছিল না। স্বভাবতই বাস্তব-কর্মনিপুণ গিরিবালার বাবা হরকুমারের সঙ্গে তার সৌহৃদ্য ঘটেনি। তদুপরি অবাধ্য প্রজাকে জব্দ করার পরামর্শ নিতে এসে হরকুমার শশিভূষণের উদাসীনতা ও নম্রতা দেখে ক্ষুব্ধ হলেন। যখন কোনো মকদ্দমাতেও জিততে পারলেন না এর পেছনেও শশিভূষণের হাত দেখতে পেলেন। ফলত শশিভূষণের খেতে গোরু ঢুকতে লাগল, কলাইয়ের গোলায় আগুন লাগল, সীমানা নিয়ে বিবাদ শুরু হলো এবং উল্টে তার নামে মামলা আনার উপক্রম হলো। আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও আইনের মারপ্যাঁচ এড়িয়ে কলকাতা-অভিমুখী হল শশিভূষণ। কিন্তু নিরুপদ্রব জীবনযাপন বিধাতাপুরুষ তার জন্যে নির্দিষ্ট করে রাখেনি, তাই নায়েব মশায়ের সঙ্গে জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেটের সংঘর্ষের সময়ে কোনো কারণ ব্যতিরেকেই হরকুমারের উপকার সাধন করতে গিয়ে কৃতঘ্নতার শিকার হতে হল শশিভূষণকে। হরকুমারকে বাঁচানোর জন্যে আইনের পুঁথিপত্র ঘাঁটতে হল শশিভূষণকে, অথচ সাহেবের সঙ্গে মিটমাট করে হরকুমার জেলার বেঞ্চে অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হল-এই সময়সীমার মধ্যে গিরিবালার দিকে দৃষ্টিদান করা হয়ে ওঠেনি শশিভূষণের, গিরিবালার বিবাহের ব্যবস্থা হওয়ায় পুরনো সুখের নীড়ও ভেঙে যায়। অন্যদিকে, শশিভূষণকে গ্রাম ছাড়ানোর কাজ চলতে থাকে এবং গ্রাম আকর্ষণশূন্য হওয়ায় কলকাতা-অভিমুখে পুনরায় চলল শশিভূষণ। কিন্তু এটিও বিধাতার ইচ্ছাবিরুদ্ধ, নইলে স্টিমারের সঙ্গে তার নৌকোর মাঝির রেষারেষি শুরু হবে কেন, মাঝি পালের ওপর পাল চড়াল, ইংরেজ ম্যানেজার আকস্মিকভাবে গুলিবর্ষণ করলে নৌকো ডুবল, জীবিত মাঝি-মল্লাদের নিয়ে শশী গ্রামে ফিরল, মাঝির ক্ষতিপূরণের জন্য মকদ্দমার প্রস্তাব করল শশিভূষণ, খরচের ব্যয়ভার বহন করতেও চাইল, কিন্তু আইন তো ইংরেজদের হাতে, তাদের প্রয়োজনে যেমন খুশি ব্যবহারযোগ্য, তাদের কোনো অপরাধই শাস্তিযোগ্য নয়, অতএব ম্যানেজার বেকসুর খালাস পেল। এরপর আবার কলকাতা-অভিমুখে যাত্রা, রেলপথে না গিয়ে নদীপথে-এই নদীপথে তার জন্যে নানাবিঘ্ন অপেক্ষমান, তাই নদীর মোহনার মুখে বাঁশ বেঁধে জেলেদের সাত-আটশ টাকার জাল ইংরেজ পুলিসের জন্য কেটে দেওয়া হল। প্রতিবাদ করতে গিয়ে শশিভূষণ অসম্মানজনক কথা শুনল। জীবন-পথে নানান বিঘ্ন বারংবার এসে শশিভূষণকে অসহিষ্ণু করে তুলেছিল তাই বোটে লাফিয়ে পুলিসের বড় কর্তাকে বালকের মতো, পাগলের মতো মারতে লাগল, ফলে জেল-হাজত, তারপর মামলা, কৃতঘ্ন মানুষের জন্যে জেল যাওয়া-সমস্ত মিলিয়ে একটি নির্বিরোধ মানুষের জীবন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। জেল থেকে বেরিয়ে গিরিবালার সঙ্গে সাক্ষাৎ হল, কিন্তু গিরিবালাও জীবনযুদ্ধে পরাজিত, অত্যল্পকালের মধ্যে স্বামীহারা হয়েছে। ক্ষীণতনু শশিশেখর, গিরিবালার বৈধব্যদশার সঙ্গে মিলে একটি সরলপ্রাণ মানুষের বেদনা অন্তহীন হয়ে গেল।

"মেঘ ও রৌদ্র" গল্পে, শশীভূষণ চরিত্রটি সামাজিক ও ব্যক্তিগত উভয় ক্ষেত্রেই জটিল। তিনি একদিকে একজন শিক্ষিত ও আধুনিক যুবক, অন্যদিকে তিনি গ্রাম্য সমাজের নিয়ম-কানুন ও ঐতিহ্যের প্রতি আবদ্ধ। শশীভূষণ গিরিবালার প্রতি তার ভালোবাসার প্রকাশ করতে না পারার কারণে একটি লুকোচুরি খেলার মতো সম্পর্ক তৈরি করেন। এই গল্পে শশীভূষণ চরিত্রটি শুধু একজন প্রেমিক নয়, তিনি একজন প্রতিবাদী ও সামাজিক সচেতন ব্যক্তিও, যিনি গিরিবালা ও অন্যান্য গ্রাম্য মেয়েদের অবস্থার উন্নতি করতে চান।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে পুরুষ চরিত্রগুলি কেবল ব্যক্তিগত আবেগ বা মানসিকতার প্রতীক নয়, তারা সমাজের বিভিন্ন দিক ও সমস্যাকেও প্রতিফলিত করে। তাদের মধ্যে প্রেম, পরিবার, সমাজ ও দেশের প্রতি গভীর

অনুভূতির পাশা পাশি, তারা সমাজের বিভিন্ন দুর্বলতা ও সমস্যাও উন্মোচন করে। এই চরিত্রগুলির মাধ্যমে, রবীন্দ্রনাথ সমাজের বিভিন্ন দিক ও মানুষের মানসিকতাকে তুলে ধরেছেন।

তথ্যসূত্র

১) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - গল্পগুচ্ছ, সাহিত্যম, কলকাতা, প্রকাশকাল: বইমেলা, ২০০৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা ২২।

২) তদেব।

৩) তদেব।

৪) ঐ বই পৃষ্ঠা সংখ্যা- ২৫।

৫) ঐ বই পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৯।

৬) ঐ বই পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৩৬১।

৭) ঐ বই পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৫৯১।

৮) ঐ বই পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৫৮৬।

৯) ঐ বই পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৫৮৯।

১০) ঐ বই পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৫৯৪।

১১) তদেব।